গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৮ সংখ্যা | ২৫ ফেব্রুয়ারি - ৩ মার্চ ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

স্মরণ করি
স্ট্যালিনের মহৎ শিক্ষা

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮
৫ মার্চ ১৯৫৩

"আমি জানি, পার্টি সদস্যদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁরা সাধারণত সমালোচনা, বিশেষত আত্মসমালোচনা পছন্দ করেন না। এইসব সদস্য যাঁদের আমার 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্ট বলতে ইচ্ছা হয়, তাঁরা প্রায়ই আত্মসমালোচনার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে যেন বলতে চান, আবার সেই অভিশপ্ত আত্মসমালোচনা, আবার আমাদের ব্যর্থতার ছিদ্রান্বেষণ—আমরা কি শান্তিতে বাস করতে পারব না? নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ সব 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্টরা আমাদের পার্টির ভাবাদর্শ, বলশেভিক মানসিকতা—এসবের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেশ, যাঁরা এ রকম মনোভাব নিয়ে চলেন, আত্মসমালোচনাকে কখনও উৎসাহের সঙ্গে যাঁরা অভিনন্দন জানাতে পারেন না, তাঁদের কাছে কি এই প্রশ্ন রাখা যায়—আমাদের কি আত্মসমালোচনা প্রয়োজন? কেন আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হয়? কী এর মূল্য?

কমরেডস, আমি মনে করি, বাতাস অথবা জলের মতোই আমাদের কাছে আত্মসমালোচনা দরকারি। আমি মনে করি, আত্মসমালোচনা ছাড়া আমাদের পার্টি এগোতেই পারে না, আমাদের দুষ্ট ক্ষতগুলিকে উন্মোচিত করতে পারে না, ত্রুটিগুলিকে দূর করতে পারে না। এবং আমাদের যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে, তা খোলা মনে সততার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত।"

জে ভি স্ট্যালিন

মস্কোর কর্মীসভায় প্লেনাম সম্পর্কিত বক্তব্য, ১৯২৮

সরকারি স্কুল বেচে দেওয়ার হীন পরিকল্পনা ফাঁস

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল শিক্ষাকে পিপিপি মডেলে বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে মিলে পরিচালনা করার পরিকল্পনার কথা সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়েছে। তাতে স্কুল শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীল নকশাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল ও সভা সংগঠিত হয়। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও প্রতিবাদ মিছিল হয়। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকার স্কুল শিক্ষাকে পিপিপি আঙ্গিকে পরিচালিত করার জন্য কয়েকটি বড় কর্পোরেট সংস্থার সংগে বৈঠক করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে। স্কুলের ভবন, সংলগ্ন জায়গা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেবে এবং ওই মালিকরাই স্কুল চালাবে ও স্কুলের মাধ্যম, কোন বোর্ডের অধীনে চলবে ইত্যাদি তাঁরাই নির্ধারণ করবে। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের অধিকারও তাঁদের হাতে থাকবে। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি অর্থ, শিক্ষাপ্রেমী ব্যক্তিদের দান ও সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে স্কুলের যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা মুনাফালোভী কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া চূড়ান্ত জনবিরোধী ও অনৈতিক। এর ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ আরও ত্বরান্বিত হবে, ফি বৃদ্ধি হবে, শিক্ষা হবে আরও ব্যয়বহুল এবং যারা বেশি মূল্যে তা কিনতে পারবে তারাই শিক্ষা পাবে। যখন করোনা মহামারির কারণে আর্থিকভাবে মানুষের নাকাল অবস্থা ও স্কুলছুট বাড়ছে, সে কারণেই সরকারের অধিকতর দায়িত্ব নেওয়ার কথা তখন সরকার শিক্ষার দায়িত্ব এইভাবে অস্বীকার

পাঁচের পাতায় দেখুন

১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

জনজীবনের দাবি নিয়ে এসইউসিআই(সি)-র নেতৃত্বে ২২ মার্চ
বিক্ষোভ মিছিল

দাবিঃ

- রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে একচেটিয়া মালিকদের কাছে বেচে দেওয়া চলবে না।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করো।
- শ্রমিক মারা নতুন শ্রম কোড বাতিল করো।
- কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের গ্যারান্টি চাই।
- জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২১ বাতিল করতে হবে।
- চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- জুটমিল সহ সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে।
- সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিজেপি প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে পশ্চিমবঙ্গে পিপিপি মডেলে স্কুল শিক্ষার বেসরকারিকরণ চলবে না।
- পশ্চিমবঙ্গে সরকারি হাসপাতালে ২৮৩টি ওষুধ বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।
- 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

জমায়েত ঃ কলকাতা, হেদুয়া পার্ক, বেলা ১টা
শিলিগুড়ি, বাঘাযতীন পার্ক, বেলা ১২টা

ছাত্র খুনের প্রতিবাদে
আমতা থানায় এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মুখ আনিস খানকে তার বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ঢুকে ছাদ থেকে ফেলে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। খুনের নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ২০ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও আমতা থানায় বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সামসুল আলমের নেতৃত্বে একপ্রতিনিধি দল আনিস খানের বাড়িতে যান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

আমতা থানার সামনে এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভ। ২০ ফেব্রুয়ারি

আগে পুনর্বাসন, পরে খনিপ্রকল্প
দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

ডেউচা-পাঁচামি

বীরভূমের ডেউচা-পাঁচামিতে প্রস্তাবিত খনি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পূর্ণ সহমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনওমতেই খনির কাজ শুরু করা যাবে না—এই দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)। ছয় জনের একটি প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে মন্ত্রীর সাথে বিস্তৃত আলোচনা করেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন ভূ-বিজ্ঞানী, প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতি ও দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক।

শিল্পমন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

এ দিন পৃথক ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন রাজ্য সম্পাদক। তাতে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের জনগণের সম্পদ। এই সম্পদ জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে এবং এর সুফল যাতে এলাকাবাসীর কর্মসংস্থান সহ সকল প্রকার উন্নয়নের কাজে লাগে তা সুনিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য। তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেন, খোলামুখ খনি নয়, আন্ডারগ্রাউন্ড খনি করতে হবে।

শিল্পমন্ত্রীর কাছে প্রতিনিধিরা খনি প্রকল্পে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পরিবারগুলি ও সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন-জীবিকার গুরুতর সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরেন। শুরুতেই গত ২৩ ডিসেম্বর'২১ দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে আদিবাসী মহিলাদের উপর পুলিশ এবং সমাজবিরোধীদের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা উল্লেখ করে অপরাধীদের গ্রেফতার, এমনকি কোনও আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ জানিয়ে অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়। আলোচনায় দাবি জানানো হয়—১) সরকারি প্যাকেজে জমির যে দাম ধার্য হয়েছে তা অত্যন্ত কম, যদিও সরকার বলছে জমিদাতাদের তিনগুণ হারে জমির দাম দেওয়া হচ্ছে, অথচ ওখানে যে দামে এখন জমি কেনাবেচা হচ্ছে তা ঘোষিত প্যাকেজের তুলনায় দ্বিগুণ। স্বাভাবিক ভাবেই জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য দ্বিগুণ করতে হবে। ২) চাকরির প্রশ্নে শুধু জুনিয়র পুলিশ বা কনস্টেবলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওখানে অনেক উচ্চশিক্ষিত এমনকি বি-টেক পাশ আদিবাসী বেকার যুবকও আছে। ফলে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতি পরিবারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সক্ষমদের স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। ৩) রেকর্ড সংশোধন করে প্রকৃত জমির মালিককে আইনি সহায়তা দিতে হবে। ভূমিহীন এবং খাস জমিতে বসবাসরত সকলকে পাট্টা দিতে হবে এবং তাদেরও রায়তদের ন্যায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। খেতমজুর এবং খাদান, ক্র্যাশারে কর্মরত শ্রমিকদের বিকল্প আয়ের মতো ব্যবস্থা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৪) পাড়া ও পুরো গ্রাম থেকে যারা উচ্ছেদ হবেন তাদের এবং বিশেষ করে আদিবাসীদের পরম্পরাগত জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশবান্ধব জায়গা সহ বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। ৫) মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ৬) মুখ্যমন্ত্রী বারবার জবরদস্তি উচ্ছেদ না করে সহমতের ভিত্তিতে কাজ শুরুর কথা বললেও, বর্তমানে এলাকার মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে একতরফা ভাবেই সরকারি জমিতে কাজ শুরুর ঘোষণা করেছেন। সেক্ষেত্রে সরকারি জায়গাতেও খনির কাজ শুরু হলে তার ধাক্কায় আশেপাশে ঘর বাড়ি এবং জমি-ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। ফলে তারা এই ধাক্কাতেই উচ্ছেদ হয়ে যাবেন। এই ঘোষণা এলাকাবাসীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর শুধু নয়, অনেকেই এই পরিকল্পনাকে দুরভিসন্ধিমূলক মনে করেন, ফলে এই কাজ থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

মন্ত্রীমহোদয় সমস্ত বক্তব্যগুলিকেই যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করেন। নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, বর্তমান সময়ে পরিবেশবিদ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা খোলামুখ খনির পরিবর্তে আন্ডারগ্রাউন্ড খনির প্রস্তাব করেছেন। তার ফলে দূষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং উচ্ছেদের ক্ষেত্রেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। মন্ত্রীমহোদয় এই প্রশ্নে আন্ডারগ্রাউন্ড খনির ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বললে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের দেশে আন্ডারগ্রাউণ্ড খনি চলছে, এখানেও এটা করা অসম্ভব নয়। মন্ত্রী তা স্বীকার করেন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সমগ্র প্রকল্পের ডিপিআর অর্থাৎ ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করা হয়। সর্বোপরি এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে দূষণ ইত্যাদি রোধে কার্যকরী আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূ-বিজ্ঞানী, খনি বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য বিশেজ্ঞ, কৃষি বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদদের মতামত নিয়ে এবং তা গ্রহণ করে কার্যকর করার দাবি জানানো হয়।

মন্ত্রীমহোদয় জানান তিনি সমস্ত বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর মতামত সহ জানাবেন। তিনি বলেন জেলায় এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে এবং নেবে সে বিষয়ে আলোচনায় বসা দরকার। এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ বীরভূম জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সমস্যাগুলি পুরোপুরি সম্মতির ভিত্তিতে মীমাংসিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কোনওভাবেই প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া চলবে না। তা না হলে এলাকার মানুষ শুধুমাত্র সরকারি প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে থাকবে, তা মোটেও হতে পারে না।

অভিজ্ঞতা বলে, বলপ্রয়োগের প্রশ্ন এলে এলাকা অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে, শান্তি-শৃঙ্খলা, সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব শুধু ওখানকার মানুষের নয়, মূলগত ভাবে তা অবশ্যই সরকারের।

খনি-আন্দোলন ভাঙতে শাসক দলের হামলা
প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

খনির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) নয়। দলের দাবি, আন্ডারগ্রাউন্ড খনি করতে হবে এবং তা করার আগে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিতে হবে। এই দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি মহম্মদ বাজারে হ্যান্ডবিল বিলি করার সময় দলীয় কর্মীদের উপর হামলা করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক ওই দিন এক বিবৃতিতে এই হামলার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ডেউচা-পাঁচামি এলাকায় কয়লা খনি প্রকল্পে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে সহমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না দিয়ে খনির কাজ শুরু করা চলবে না—এই দাবি এসইউসিআই (সি) প্রথম থেকে করে আসছে। ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে ইতিমধ্যে একাধিকবার জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া স্মারকলিপি নিয়ে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে এসইউসিআই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ছয় জনের প্রতিনিধি দল ১৫ ফেব্রুয়ারি দেখা করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি মহম্মদ বাজারে দাবি-হ্যান্ডবিল নিয়ে প্রচারের সময় তৃণমূলের ২০-২২ জনের বাইকবাহিনী অতর্কিতে হামলা করে। জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড স্বাধীন দলুই সহ অন্যান্য কর্মী, এমনকি মহিলা কর্মীদেরও ধাক্কাধাক্কি করে ও ঘুষি মারে। পুলিশের উপস্থিতিতেই দুষ্কৃতীরা প্রচারপত্র সহ অন্যান্য কাগজপত্র, ফ্লেক্স কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেয় এবং এলাকা থেকে প্রচারকর্মীদের চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। এইভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে মতামত প্রকাশের পরিবেশ ধ্বংস করে সন্ত্রাসের বাতাবরণের দ্বারা বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করার বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার লাউদোহা অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড হেলা রুইদাস দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা সম্পাদক সহ দলের নেতা কর্মীরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জি, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী সহ জেলার অন্যান্য নেতা ও এলাকার কর্মী-সমর্থকরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

১৯৬৭ সালে যখন লাউদোহা এলাকায় প্রয়াত কমরেড বিশ্বপ্রকাশ গোস্বামীর নেতৃত্বে বর্গা ও ভাগচাষিদের ন্যায্য দাবিতে দলের আন্দোলন গড়ে উঠছে, কমরেড হেলা রুইদাস সেই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই জন্য তার উপর বারবার আক্রমণ নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন তাকে গ্রামের বাইরে থাকতে হয়েছে। পরবর্তী কালে সিপিএমের আমলেও তিনি একই ধরনের আক্রমণের মুখে পড়েছেন। অভাব অনটন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও দলের প্রতি তাঁর আস্থা শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মীকে হারাল।

কমরেড হেলা রুইদাস লাল সেলাম

বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমাতে হবে

সম্প্রতি সিইএসসি-র ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ বর্ষের মাশুল বাড়ানোর প্রস্তাব গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার প্রবল যুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বাতিল করেছে। অ্যাবেকার বক্তব্য মাশুল বাড়ানোর কোনও প্রয়োজনই নেই। বরং তা ৫০ শতাংশ কমনো যেতে পারে। বিদ্যুতের দাম কীভাবে কমানো যেতে পারে সে সম্পর্কে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) বারবার তুলে ধরেছে যে, ২০১৬-১৭-তে কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমে যাওয়াতে সিইএসসি-তে এক বছরে ৭৬০.৯৬ কোটি ও পিডিসিএল-এ ২৪০০.৫৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এ ছাড়াও জিএসটি ৭ শতাংশ কমায় এক বছরে সিইএসসি ওই বছরে ১৩৮.১৮ কোটি ও রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম ৩৬০.৯৫ কোটি টাকা কম খরচ করেছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিতে কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি ২ শতাংশ কম হওয়ার ফলে দুই কোম্পানির সাশ্রয় হয়েছে যথাক্রমে ১৮৬.৭০ কোটি ও ৪২৭.৫৪ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তৎকালীন

ডায়মন্ড হারবার কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে বিক্ষোভ

পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লিখিতভাবে এই দুই কোম্পানির মোট ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করতে হয়নি জানালে উনিও মাশুল কমানো উচিত স্বীকার করেন। বিষয়টি মন্ত্রীসভায় তুলবেন বলেছিলেন।

রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রী গত অক্টোবর মাসে ঘোষণা করেছিলেন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কয়লার ৬০ শতাংশ ক্যাপটিভ কয়লাখনিগুলো থেকেই ৩০ শতাংশ কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীও গত সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেছিলেন ক্যাপটিভ কয়লাখনি থেকে কয়লা পাওয়া গেলে বিদ্যুতের দাম কমবে। (বর্তমান ০২-৯-২০২১) গত ১ জানুয়ারি ডব্লুবিপিডিসিএল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ পি বি সালিম জানিয়েছেন, তাঁদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা কমাতে

কলকাতার তারাতলায় গ্রাহকরা দাবিপত্রে স্বাক্ষর করছেন

সক্ষম হয়েছেন। তা হলে দাম কমানো হবে না কেন?

গত বছর ২৫ আগস্ট রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০-র জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি যে মাশুল নির্ধারণের অর্ডার দেয় তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ২০১৬-১৭ বর্ষের বিদ্যুৎ মাশুল হিসাবে যা নেওয়া হয়েছে তা থেকেই পিডিসিএল-এর পাওনা টাকা এবং কোম্পানির পরবর্তী বছরগুলির মোট রাজস্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে ঐ অর্ডারে ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত এমভিসিএ (মাস্থলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) খাতে কোনও টাকা আদায় করা যাবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬-১৭ বর্ষে অস্বাভাবিক হারে মাশুল বাড়ানো হয়েছিল, যা তখনকার সময়ে কোম্পানির প্রয়োজনেরও বেশি। আবার নেওয়া যাবে না বলা হলেও এমভিসিএ খাতে এপ্রিল ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত কোটি

গ্রাহকদের দাবি

১. বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমাতে হবে।
২. এলপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটে করতে হবে।
৩. ট্যারিফ অর্ডার ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অনুযায়ী ২০১৬-'১৭ বর্ষে বাড়তি নেওয়া টাকা গ্রাহকদের ফেরৎ দিতে হবে।
৪. ট্যারিফ অর্ডার ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অনুযায়ী এমভিসিএ বাবদ কেটে নেওয়া (এপ্রিল ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) টাকা গ্রাহকদের ফেরৎ দিতে হবে।
৫. চাষের সময় কৃষি বিদ্যুতে লাইন কাটা চলবে না, সমস্ত কাটা লাইন জুড়ে দিতে হবে।
৬. সমস্ত খারাপ ও বন্ধ মিটার পরিবর্তন ও বিল সংশোধন করতে হবে।
৭. সমস্ত অফিসে (বিশেষ করে সিসিসি লেভেলে) গ্রাহকদের অভিযোগপত্র জমা নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৮. মাতৃভাষাতে সহজবোধ্য করে বিদ্যুৎ বিল করতে হবে।
৯. স্পট বিলিং এর বিল আইন অনুযায়ী এবং প্রিজার্ভ করার যোগ্য করতে হবে।
১০. লকডাউন পিরিয়ডের ক্ষুদ্র শিল্পের ফিক্সড চার্জ মকুব করতে হবে।
১১. প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের বিনা অনুমতিতে লাগানো চলবে না।
১২. সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর কোনও রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করা চলবে না।
১৩. জঙ্গলমহল, চা-বাগান ও লাইফ লাইন গ্রাহকদের বকেয়া বিলের টাকা মকুব করে বিল রেগুলারাইজ করতে হবে।
১৪. কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এককালীন এলপিএসসি মকুব করে বকেয়া এনার্জি চার্জের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৫. সিইএসসি-তে সার্ভিস কানেকশন চার্জ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির সমতুল্য করতে হবে।
১৬. কৃষিতে বিনামূল্যে এবং গৃহস্থে মাসে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।
১৭. জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও সংশোধনী বিল ২০২১ বাতিল করতে হবে।

কোটি টাকা গ্রাহকদের থেকে কোম্পানি তুলে নিয়েছে। সুতরাং মাশুলের বাড়তি টাকা এবং এমভিসিএ খাতের অন্যায়ভাবে কেটে নেওয়া টাকা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া উচিত এবং বিদ্যুতের মাশুল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো এবং ন্যায্যত কমানো উচিত।

গ্রাহকদের কাছ থেকে চড়া হারে লেট পেমেন্ট সারচার্জ (এলপিএসসি) আদায় করে বিদ্যুৎ কোম্পানি। বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান মেনে নিয়েছিলেন যে এই চার্জ ব্যাঙ্ক রেটের বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। দেশের মধ্যে পাঁচটি কৃষিপ্রধান রাজ্য কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিলেও অন্যতম কৃষিপ্রধান এই রাজ্যে কৃষিতে বিদ্যুতের মাশুল দেশের মধ্যে সর্বাধিক। গত লকডাউনের সময় ক্ষুদ্র শিল্প পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও তাদের ঘাড়ে বিশাল অঙ্কের ফিক্সড চার্জের বোঝা চাপানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে চলেছে। লাইফ-লাইন গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাসে মাত্র ২৫ ইউনিট বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যাতে কার্যকর না করতে হয় তার জন্য নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আবেদনপত্রে রাজ্যের প্রায় কোনও গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রেই ৩০০ ওয়াটের কমে লোড লিখতে দেওয়া হচ্ছে না এবং কেউ লিখলে তার আবেদন ফর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে না। বন্ধ, খারাপ হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মিটার সময়মতো পরিবর্তন করা হচ্ছে না এবং খারাপ থাকাকালীন ইচ্ছামতো বাড়তি টাকার বিল পাঠিয়ে দেওয়া চলছেই। এর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগপত্র পর্যন্ত গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের স্টেশন ম্যানেজার গ্রহণ করতে রাজি নয় যা নিয়ে প্রায়শই গ্রাহকদের পোস্ট অফিসের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে বাধ্য করা হচ্ছে।

জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ও সংশোধনী বিল-২০২১

আলিপুরদুয়ারে গ্রাহকদের থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

আইনে পরিণত হবার আগেই রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি তাদের সমস্ত স্তরের অফিসের কাজ, মেরামতি, মিটার রিডিং, বিল তৈরি, বিতরণ, নতুন কানেকশন সহ সমস্ত কিছু কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে করছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ শিল্পে বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। বাড়ছে চুরি-দুর্নীতি, যার দায়ভার আবার গ্রাহকদের উপর বর্তাচ্ছে। সম্প্রতি প্রি-পেইড মিটার লাগানোর সিদ্ধান্ত এবং সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারে বাধা নিষেধ আরোপের রেগুলেশন কার্যকরী করার মাধ্যমেও জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল-২০২১ এর প্রয়োগ করার চেষ্টা চলছে।

একদিকে পর পর দুই বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হয়েছে তার উপর এই বোরো চাষের সময় লাতারে বকেয়া টাকা আদায় করতে লাইন কাটা হয়ে চলেছে। এর ফলে এবার প্রায় ২০ শতাংশ বোরো চাষ কমেছে, যার ফলে রাজ্যে চালের দাম বাড়ছে।

এ সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করছে দীর্ঘ প্রায় ৪/৫ বছর ধরে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় কোম্পানি গ্রাহকদের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়তি আদায় করেছে। এর সাথে সিইএসসি-তে নতুন কানেকশন নিতে বা মিটার সিফটিং এ অস্বাভাবিক সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়, যা রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ক্ষেত্রে নেওয়া হয় লোডভিত্তিক। দাবি উঠছে সিইএসসি-তেও লোডভিত্তিক সার্ভিস কানেকশন চার্জ নিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অ্যাবেকা কয়েক মাস ধরে সারা রাজ্য ব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছে। **বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমাতে হবে এই দাবিতে ২ মার্চ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও এসইডিসিএল-এ বিক্ষোভ দেখাবে অ্যাবেকা।** এর সাথে আরও ১৬ দফা দাবি তুলেছে সংগঠন।

সরকারি কর্মচারীদের হেলথ স্কিমে আধার লিঙ্ক অপ্রয়োজনীয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশিষ দাস হেলথ স্কিম পোর্টালে বেনিফিসিয়ারিদের আধার কার্ড যুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অবিলম্বে ওই অর্ডার বাতিলের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন,

সরকারি কর্মীদের পরিচিতির জন্য সরকারি পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড, স্যালারি অ্যাকাউন্ট থাকা সত্ত্বেও আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা একটি অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ। সরকারি কর্মচারীদের এই প্রকল্পের সাথে সাধারণ মানুষের সামাজিক প্রকল্পের কোনও সম্পর্ক নেই। সরকারি কর্মচারীরা তাদের চিকিৎসা ভাতার বিনিময়ে হেলথ স্কিমের বেনিফিট পান। আধার কার্ড যুক্ত না করলে হেলথ স্কিমের বেনিফিট পেতে অসুবিধায় পড়তে হবে বলে এই অর্ডারে যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

শ্রমিকের প্রাণরক্ষার দায়ও ঝেড়ে ফেলছে মালিক এবং সরকার

খনি এবং কারখানা দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল যেন দেশে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'দিন হইচইয়ের পর সমস্ত ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে, কোথাও শ্রমিক বিক্ষোভ হলে কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করে দায় সারছে অথবা পরিবারের সদস্যদের হাতে সামান্য কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে ৩ জন শ্রমিক কাজ করতে করতে বিষাক্ত গ্যাসে মারা গেলেন। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও চার জন। কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিক নিরাপত্তার অভাবই এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ। ২৬ জানুয়ারি দুর্গাপুরের ফরিদপুর-লাউদোহা ব্লকে খোলামুখ কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে একই পরিবারের চারজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এর চারদিন পর ঝাড়খণ্ডের নিরশার খোলামুখ কয়লাখনিতে পাথরের চাঁই চাপা পড়ে প্রাণ হারান পাঁচ জন। বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা, মেঘালয়ের খনিগুলিতে প্রতি দিন কয়েক লক্ষ শ্রমিক জীবন বাজি রেখে কয়লা তুলতে নামেন। ঠিকা, অস্থায়ী এবং চুক্তি শ্রমিকদের দিনের পর দিন নামমাত্র বেতনে কাজ করতে হয়। কাজেরও নিরাপত্তা নেই, নেই জীবনের নিরাপত্তাও।

কেন নিরাপত্তা নেই? নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফায় যাতে টান না পড়ে সেই কারণে মালিকরা নিরাপত্তার কোনও দায়িত্বই পালন করে না। দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকের প্রাণের ঝুঁকির নিরিখে ভারতের খনিগুলি সর্বাধিক ঝুঁকিসম্পন্ন খনির অন্যতম। সম্প্রতি সংসদে দেওয়া তথ্য, ২০১৫-২০১৭ সালের মধ্যে ভারতের কয়লাখনিতে ২১০ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন, '১৯-'২০-তে ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু কয়লাখনিতে, তাও নথিভুক্ত ঘটনা। অনথিভুক্ত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

শ্রমিক-দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখে যে কোনও মানুষ আঁতকে উঠবেন। যেন এগুলি অনিবার্যই ছিল। হরিয়ানার গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ কারখানায় প্রতি বছর প্রায় পাঁচশো শ্রমিকের আঙুল ও হাত কাটা যায়। পরবর্তীকালে পঙ্গু হয়ে কর্মহীন জীবন কাটে এঁদের। এই কর্মীরা মূলত ঠিকাশ্রমিক। ঠিকাদারের অধীনে তারা কাজ করে, আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর প্রশিক্ষণ এঁদের নেই। এঁরা ঠিকাশ্রমিক হওয়ায় নিয়োগকারী সংস্থা এদের 'দিন আনি দিন খাই' মজুরে পরিণত করে রেখেছে। দুর্ঘটনা ঘটলে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়ও থাকে না নিয়োগকারী সংস্থার। কারণ কোনও আইনের বেড়াতে তা আটকায় না। কারখানার শোষণ-যন্ত্রের চাকায় পেষাই শ্রমিক মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার জোগান দিতে বাধ্য হয়। সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে শোষণ চলতে থাকে অনায়াসে।

অথচ কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা শ্রমিকের প্রাথমিক এবং অলঙ্ঘ্য অধিকার। বহু যুগ ধরে বহু আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তা অর্জিত হয়েছিল। তা দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছে মালিকপক্ষ। তার অনুমোদন দিচ্ছে জনবিরোধী সরকারগুলি।

ভারতে চুক্তি শ্রমিক আইন (১৯৭০) অনুসারে, কুড়ি জনের বেশি (নতুন শ্রমবিধি অনুসারে ৩০০ জন) শ্রমিক নিয়োগ করে যে সংস্থা, তাকে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। তা এড়াতে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করছে কর্তৃপক্ষ। তাদের কাজের নিরাপত্তা কম থাকায় তারা স্থায়ী কর্মীদের মতো সংগঠিত হতে পারছেন না। মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নিরাপত্তার দাবি তুলতে পারছেন না। 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট' বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ আইনে (২০১৮) বলা হয়েছে, চুক্তি ফুরোলে কোনও কারণ না দেখিয়েই কর্মীদের ছাঁটাই করা যাবে। এর পূর্ণ সদব্যবহার করছে মালিকরা। যদিও এই আইনগুলির কোনওটাতেই বলা নেই, স্থায়ী শ্রমিকদের মতো বেতন কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার নেই চুক্তি বা ঠিকা শ্রমিকদের। বাস্তবে তার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে শ্রমিক।

আগেকার শ্রমআইনগুলিতে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বহু বিষয় থাকলেও তা কথার কথাতেই রয়ে গেছে। আজ আর সেই আব্রুটুকুও নেই। সম্প্রতি সংসদে বিজেপি সরকার শ্রমিকদের জন্য চারটি শ্রমবিধি পাশ করিয়েছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সেই বিধির বিরুদ্ধেই শ্রমিক সংগঠনগুলি ২৮-২৯ মার্চ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তাতে পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও কাজের পরিস্থিতি সংক্রান্ত শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা আরও কমানো হয়েছে। স্বভাবতই কমছে শ্রমিকদের নিরাপত্তা। শ্রমিকের কাজের এবং বেঁচে থাকার অধিকার পেতে বর্তমান ব্যবস্থা ও তার সেবাদাস সরকারগুলির বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে।

দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল কর

১৭ ফেব্রুয়ারি 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি' মদের 'ই রিটেল' ব্যবসার প্রতিবাদে বউবাজারে আবগারি দফতরের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। নেতৃত্ব দেন সমিতির কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে তনুশ্রী শাসমল, তপতী দাস ও রুমা পণ্ডা।

এআইকেকেএমএস-এর ডেবরা ব্লক সম্মেলন

সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে এবং ধানের সহায়ক মূল্য ২৫০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সহ নানা দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি এআইকেকেএমএস-এর ডেবরা ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বালিচক গার্লস স্কুলে। কার্তিক নায়েককে সভাপতি এবং রাখাল মণ্ডল ও অরুণ দুয়াকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২১ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক প্রভঞ্জন জানা।

২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ স্মরণ

এআইডিএসও পরিচালিত যোগমায়া দেবী কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে কলেজ প্রাঙ্গণে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস পালন করা হয়

ট্রাফিক ফাইন কমানোর দাবিতে লালবাজারে বিক্ষোভ

বাইক ট্যাক্সির আইনানুগ স্বীকৃতি আজও দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার। এঁদের উপর পুলিশি জুলুম নানা ভাবে চলছে। ট্রাফিক ফাইন এত বেশি পরিমাণে নির্ধারণ করা হয়েছে যে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত বেকাররা বিপন্ন। বিপরীতে সরকার ওলা, উবের, র‍্যাপিডো ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানির প্রতি বেশি পরিমাণে উদার। এঁদের উপর নিয়ন্ত্রণ, নতুন ট্রাফিক ফাইন প্রত্যাহার ও বাইক ট্যাক্সির আইনানুগ স্বীকৃতির দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি লালবাজারে বিক্ষোভ দেখায় কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন। তিন শতাধিক চালক উপস্থিত ছিলেন। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের সভাপতি শান্তি ঘোষ।

হুগলির আরামবাগের রামমোহন হলে ব্যাঙ্কের কনট্রাকচুয়াল কর্মীদের সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সিবিইইউএফ-এর সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার, এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক তপন দাস প্রমুখ।

আনিস খান হত্যা ঃ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু আসলে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ রয়েছে শিল্পী সাংস্কৃতিককর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ও সরকারি দলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে।

মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ২০ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে কোনও প্রতিবাদী চরিত্রকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা, কার্যত গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করে এবং স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের পথকেই সুগম করে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মঞ্চের দাবি, যেহেতু অভিযোগ স্থানীয় পুলিশ এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, তাই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনকারী এবং আনিসের পরিবারের আস্থাশীল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে এর তদন্ত করানো দরকার।

নাগরিক সভা নন্দীগ্রামে

নন্দীগ্রাম নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে নন্দীগ্রামের সব মৌজায় নিকাশি, নন্দীগ্রাম হলদিয়া ব্রিজ, রেল প্রকল্প রূপায়ণ, নদীবাঁধ নির্মাণ সহ অন্যান্য দাবিতে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে নাগরিক সভা হয় ২০ ফেব্রুয়ারি। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিমাংশু মুনিয়ান, আনসার হোসেন, ভবানী প্রসাদ দাস, সবুজ প্রধান, মনোজ দাস, মুসিয়ার রহমান সহ অন্যরা। বক্তারা দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হীন পরিকল্পনা

একের পাতার পর

করতে চাইছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তেও এমন বেসরকারিকরণের প্রস্তাব আছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সরকারকে বিরত হওয়ার দাবি করছি।

এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পৌঁছলে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ কান্তি নস্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী প্রমুখ।

তীব্র প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

স্কুল শিক্ষাকে পিপিপি মডেলের মাধ্যমে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিএসও। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে বেসরকারি মালিকদের হাতে স্কুল শিক্ষাকে তুলে দেওয়ার এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এআইডিএসও ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে। সংবাদে প্রকাশ, ৮০ শতাংশ প্রযুক্তিগত দিকের সঙ্গে ২০ শতাংশ আর্থিক সঙ্গতি থাকলেই সরকারি স্কুলের জমি, বিল্ডিং সহ সমস্ত পরিকাঠামো যে কোনও বেসরকারি সংস্থা বা মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিপুল ফি-র বোঝা যারা বইতে পারবে তাদের জন্যই এই সব স্কুলের দরজা খোলা থাকবে। করোনা অতিমারিকে কেন্দ্র করে প্রায় দু'বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল এবং সরকারি অবহেলায় রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই স্কুলছুট। এই অবস্থায় যখন দরকার ছিল স্কুলছুটদের ক্লাসরুমে ফেরানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত এই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়ভার সরকারের পক্ষ থেকে বহন করা, শিক্ষার সর্বস্তরে ফি মকুব করা, তখন রাজ্য সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কিংবা বহু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির দানে গড়ে ওঠা সরকারি স্কুলের জমি, বাড়ি, পরিকাঠামো তুলে দিচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ মধ্য দিয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে কর্পোরেটদের হাতে তুলেদেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে তাকেই বাস্তবায়িত করছে এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

রেল ব্যবসায় ঢুকে দেশের সম্পদের উপর
একচেটিয়া দখলদারির ছক আদানিদের

রেল দেশের লাইফলাইন। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার চাইছে তাকে বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে। এই পরিকল্পনাতেই বিজেপি সরকারের সাহায্যে আদানি গোষ্ঠী রেলে ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। তা আরও বিস্তৃত করতে নেমে পড়েছে তারা। ২০২৫ সালের মধ্যে দু'হাজার কিলোমিটার রেলপথের মালিকানার লক্ষ্যে আদানি ভারতীয় রেলের সঙ্গে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ করে এগোতে চাইছে। এই উদ্দেশ্যে বিডিআরসিএল, ধামড়া, সারগুজা, মুন্দ্রা, কৃষ্ণাপতনম রেল কোম্পানি এবং কচ্ছ রেল (মোট ৬৯০ কিলোমিটার রেলপথ হিসাবে) এই ৬টি সংস্থাকে আদানি ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস নামে একটি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে (আদানি বন্দর এবং স্পেশাল ইকনমিক জোনের একশো শতাংশ রয়েছে এর কবজায়)।

আদানির এতটা আগ্রহের কারণ কী? রেলপথে বিনিয়োগ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সুরাহা দেওয়া, নাকি অতি মুনাফা? দ্রুতগামিতার জন্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণে সড়ক পরিবহণ থেকে রেল পরিবহণ প্রাধান্য পেয়েছে সরকারের কাছে। কিন্তু এই প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গি। কর্পোরেট সংস্থার ব্যবসায় সুবিধার জন্য অত্যাধুনিক ফ্রেট করিডর সহ নানা পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ চলছে দ্রুতগতিতে, প্রতি বছর সেখানে লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করছে সরকার। অথচ নিত্যযাত্রী সাধারণ মানুষের সুযোগসুবিধার জন্য রেলের পরিকাঠামো উন্নত করা এবং রেলযাত্রা সুলভে করা দূরে থাক, সেই খাতের বাজেটে বরাদ্দ ক্রমশ কমছে, বাড়ছে টিকিটের দাম। ২০২২-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে কোনও কোনও লাইনে মাত্র এক হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই নামমাত্র টাকায় কী উন্নয়ন করা সম্ভব তা সরকারই বলতে পারবে! স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই কর্পোরেট-প্রীতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে বেসরকারি পুঁজিমালিকরা। একদিকে সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা রেলপথকে ব্যবহার করে, অন্য দিকে লাভের হিসাব কষে তারা রেলের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে কবজা করতে বিশাল পুঁজি নিয়ে নেমে পড়েছে। সুতরাং মুখে সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা যতই ভাল ভাল কথা বলুন না কেন, একচেটিয়া পুঁজিমালিক এবং তার প্রসাদধন্য সরকার বাস্তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতোই রেল পরিষেবার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটিকেই যথেচ্ছ ব্যবসার খোলা মাঠ হিসেবে ছেড়ে দিচ্ছে।

আদানি গোষ্ঠী রেলে প্রথমে মালিকানার অংশীদার হয় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এবং শেষ পর্যন্ত তার একচেটিয়া দখল নেয়। রেলপরিবহণ ব্যবসাকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে ধনকুবের আদানি বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ করে রেলের সাথে যুক্ত নানা ব্যবসায় ঢোকার সুযোগ পাবে। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি ওয়াগন ও রেকের ব্যবসায় ঢুকতে পারবে। চার বছর আগে ভারতীয় রেল নিজে যে সমস্ত পণ্য পরিবহণ করত, সেই কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ দ্রব্যের মতো পণ্য পরিবহণও এবার চলে আসবে আদানিদের আওতায়। ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন, বন্দর ও সমুদ্র-বন্দর আদানি গোষ্ঠীর হাতে এসে গিয়েছে।

কর্পোরেট পুঁজি যেমন সবদিক থেকে বিজেপিকে সাহায্য করছে, তেমনি বিজেপিও দেশের শাসক হিসেবে কর্পোরেট পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে সমস্ত আইন, বিধি ও নীতিকে নতুন করে তৈরি করছে। দেশের যাবতীয় সম্পদ লুট থেকে শুরু করে অর্থনীতিতে কর্পোরেট পুঁজির পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েমে সব দিক থেকে মদত দিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। ২০২২-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে কর-সারচার্জ ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করে দেওয়ার মতো বেশ কিছু ছাড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দিয়েছে। এর ফলে জনগণের ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির আরও বোঝা চাপবে।

ফলে রেল সহ নানা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সেগুলির নানা অনুসারী শিল্প এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পরিবহণের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যাবে দিনে ১০০২ কোটি টাকা আয়ের মালিক আদানি গোষ্ঠীর হাতে। ৬.৭২ লক্ষ কোটি টাকার মালিক আদানি মুনাফা আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রেলপথকে ব্যবহার করে যে সাধারণ মানুষকে আরও লুঠ করবে, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

(তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৩১ জানুয়ারি, ২০২২)

মালদার বামুনগোলা থানার পাকুয়ায় এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি 'দুয়ারে মদ'-এর কালা সার্কুলার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

প্রকাশিত হল

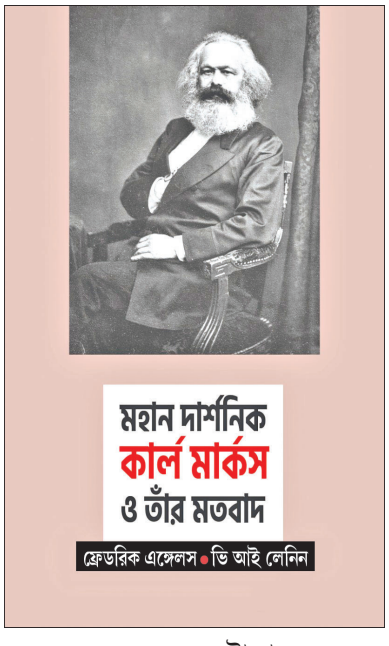

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

ফেসবুক কি শাসকশ্রেণির একটি হাতিয়ার ?

মুনাফার স্বার্থে বিদ্বেষমূলক ও ভুয়ো তথ্য ঠেকানোর দিকে নজর দিচ্ছে না ফেসবুক। আজকের দুনিয়ায় এই সমাজমাধ্যমের ব্যবহারের পরিধি বিশাল। অথচ এই মাধ্যমটি আমাদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমরা এমন একটি তথ্য-নির্ভর পরিবেশে আছি যা ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং বিভেদমূলক বিষয়বস্তু দিয়ে ভর্তি। এটি ব্যক্তির নাগরিক বিশ্বাসকে ক্ষয় করতে থাকে এবং অন্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কমাতে থাকে। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিগত হিংসারও জন্ম দিচ্ছে ফেসবুক। কথাগুলো যে কেউ বলেছেন না—দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমাজ মাধ্যম ফেসবুক, যার মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৮০কোটি, তার সম্বন্ধে এই মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন তাদেরই প্রাক্তন কর্মী ফ্রান্সেস হাউগেন। ২০১৯-এ এই আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারকে তাদের সিভিল ইন্টিগ্রিটি টিমের একজন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে ফেসবুক। এই দলটি তৈরি করা হয়েছিল বিশ্বজুড়ে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ রোখা ও নির্বাচন চলাকালীন ভুয়ো তথ্যের প্রচার ঠেকানো জন্য। কিন্তু ২০২০ তে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ফেসবুক এটিকে বন্ধ করে দেয়। ফ্রান্সেসের মতে, এটি গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যত দিন যেতে থাকে ফ্রান্সেস বুঝতে পারেন যে, ফেসবুক ফেক-নিউজ, গুজব, হিংস্রতার মতো বিষয়গুলিকে আটকানোর বিষয়টা আদৌ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না।

এর ফলে বিশ্বের নানা জায়গায় ফেসবুক মারফত প্রচারিত মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক খবরকে ভিত্তি করে জাতপাত-ধর্ম- বর্ণ-ভাষাগত বিষয় নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটছে এবং মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। তাই এ বছর মে মাসে তিনি ফেসবুকের কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু কাজ ছাড়ার আগে কম্পিউটার থেকে ফেসবুকের হাজার হাজার গুরুত্বপূর্ণ ফাইল হাউগেন ডাউনলোড করে নেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, বিশ্ববাসীর কাছে সমস্ত বিষয়টা উপস্থিত করবেন। কিন্তু ডকুমেন্টের সংখ্যা এত বিশাল যে দু- একজন সাংবাদিকের পক্ষে এটা পড়া ও লেখা সম্ভব নয়। তাই ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, সি এন এন-এর মতো আমেরিকার ১৭টি সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরই তা জনগণের সামনে আসে।

এই পুরো প্রজেক্টের নাম দেওয়া হয় 'দ্য ফেসবুক পেপারস'। ফ্রান্সেস শুধু সংবাদমাধ্যমের কাছে গেছেন তা নয়, আমেরিকার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে আটটি অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন ফেসবুকের বিরুদ্ধে। গত ৫ অক্টোবর আমেরিকার সিনেট কমিটির কাছে নিজের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করেছেন। হাউগেন বলেছেন যে, তার উদ্দেশ্য ফেসবুকের সুনাম নষ্ট করা নয়, বরং এ থেকে যে বিপদ উপস্থিত হচ্ছে তা থেকে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের রক্ষা করা।

ভুয়ো খবর ও বিদ্বেষমূলক পোস্টকে উৎসাহ দিচ্ছে ফেসবুক

ফেসবুক খুললে আপনি কী দেখবেন, স্ক্রিন স্ক্রোল করতে করতে কী কী ছবি, পোস্ট আমার-আপনার সামনে আসবে, এগুলো কে ঠিক করে? ঠিক করে গাণিতিক কিছু নির্দেশনা, কম্পিউটারের পরিভাষায় যাকে বলা হয় অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদমই ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া এবং গুগলের মতো সার্চ ইঞ্জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফেসবুকের অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের কী কী দেখতে উৎসাহিত করছে তা বোঝার জন্য গবেষকরা ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে এক ভারতীয়র নামে ডামি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলেন। তাঁরা এই অ্যাকাউন্টে কোনও লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করেননি। গবেষকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন, মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে ফেসবুক তার নিজস্ব অ্যালগরিদমের সাহায্যে ওই অ্যাকাউন্টে ভুয়ো সংবাদ, শিরোচ্ছেদের ছবি, বিদ্বেষ-উত্তেজনা-হিংস্রতা ভরা ছবি বা খবর তুলে ধরছে। আরও দেখা গেল, যে এই সব পোস্টগুলো সবই পাকিস্তান ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। গবেষকরা আরও দেখলেন, যদি ফেসবুক তার অ্যালগরিদমের সাহায্যে একজন ব্যবহারকারী কী চায় তা বুঝতে না পারে তাহলে, সে নিজেই তাকে অশ্লীল ভিডিও ও পর্ণোগ্রাফিও পাঠাচ্ছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বিষয়টি তাদের নজরে আসতেই তারা অ্যালগরিদম পরিবর্তন করেছে।

ফেসবুকের দাবি সঠিক নয়

নথি দেখাচ্ছে ফেসবুক মুখে যা বলে, বাস্তব তা নয়। প্রথমত, স্বচ্ছতার জন্য ফেসবুক যত অর্থ ব্যয় করে তার সিংহভাগই আমেরিকার জন্য (৮৭ শতাংশ), বাকি বিশ্বের জন্য খুবই নগণ্য। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের পোস্টকে চিহ্নিত করার মতো প্রযুক্তিরও অভাব আছে ফেসবুকে। ভারতে মোট কুড়িটি ভাষায় ফেসবুক চললেও মাত্র পাঁচটি ভাষায় এই ধরনের প্রযুক্তি আছে। ২০২০-র এপ্রিল মাসের আগে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ভুয়ো খবর ও বিদ্বেষমূলক পোস্ট চিহ্নিত করার মতো অ্যালগরিদম ফেসবুকের ছিল না। ফেসবুক দাবি করে যে, প্রযুক্তি না থাকলেও এই কাজে সে ভারতে পনেরো হাজার কর্মী নিয়োগ করেছে। কিন্তু ফেসবুক পেপারস দেখাচ্ছে, ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ নয়। 'অ্যাডভারসিয়াল হার্মফুল নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া কেস স্টাডি' নামের একটি ডকুমেন্টে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে ফেসবুক যত পোস্ট রিমুভ করেছে, তার থেকে বহুগুণ বেশি বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক পোস্ট, ভুয়ো খবর, উত্তেজক ভিডিও জেনে বুঝে রেখে দিয়েছে। আরএসএস ও তার বিভিন্ন শাখা সংগঠন, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন যদি এই ধরনের পোস্ট করে তা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো সরায়নি ফেসবুক। এই সমস্ত ব্যক্তিদের বিপজ্জনক বলে নিষিদ্ধও করেনি।

২০১৯-এ 'আভাজ' নামে একটি ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থার প্রতিনিধি আলফিয়া জোয়ার ফেসবুকের ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে একটা ভিডিও মিটিংয়ে ১৮০টি এমন পোস্টের উদাহরণ দেন যেখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। জোয়ার দেখান, অসমে এক বিজেপি নেতা ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ তুলে মুসলিম বিরোধী পোস্ট ছড়িয়েছেন। মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছে, বিজেপি নেতা টি রাজা ফেসবুকে মুসলিম বিরোধী এক ভয়ানক উত্তেজক ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রাখেন, মুসলিমদের প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকিও দেন। ফেসবুক কর্মীরা তাকে বিপজ্জনক বলে বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা দেন ভারতে ফেসবুকের সর্বোচ্চ পাবলিক পলিসি এক্সিকিউটিভ অফিসার আঁখি দাস। তিনি বলেন, বিজেপির কোনও নেতাকে শাস্তি দিলে বা নিষিদ্ধ করলে ভারতে ফেসবুকের ব্যবসা মার খাবে। বিষয়টি সামনে আসায় তীব্র প্রতিবাদের জেরে দু'মাসের মধ্যে আঁখি দাসকে পদত্যাগ করতে হয়। ফেসবুকের প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক অ্যালেক্স স্টামোস বছর দুয়েক আগে টুইটারে লেখেন, 'ফেসবুকের মুখ্য সমস্যা হল আমাদের নীতিনির্ধারকদের সরকারকে খুশি করতে হয়, আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মও মানতে হয়। স্টামোস বলেছিলেন, স্থানীয়ভাবে ফেসবুকে যাদের নীতিনির্ধারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তারা বেশিরভাগ শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হন। ২০২০-র ডিসেম্বরে আরও একটা লেখায় দেখা যায়, বজরং দল ভারতে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মারাত্মক বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়াচ্ছে। এদের নিষিদ্ধ করারও দাবি ওঠে। কিন্তু ফেসবুক সেই সাহস দেখাতে পারেনি। এরকম ঘটনা শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ঘটছে।

মেরুকরণে মদত দিচ্ছে সোসাল মিডিয়া

২০০৩-০৪ সালে ফ্রেন্ডস্টিয়ার, মাইস্পেস ও ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যম যখন শুরু হয় তখন এর উদ্দেশ্য ছিল খুব সাধারণ। বলা হয়েছিল নানা ভাবনা ও মতবাদের পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে এক মঞ্চে নিয়ে আসা, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা, পরস্পরকে যুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। অবস্থা বদলাতে শুরু করলো ২০০৯ থেকে, যখন ফেসবুক 'লাইক বাটন' আর টুইটার 'রিটুইট ফিচার' নিয়ে এলো। শুরু হল লাইক পাওয়া আর ফলোয়ার বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। কমেন্টস অনেক ক্ষেত্রেই আগের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ থাকল না, হয়ে উঠল যে কোনও উপায়ে 'আমি ঠিক, আর তুমি ভুল' প্রতিপন্ন করার মাধ্যম। ফেসবুক বদলে দিল তার 'নিউজ ফিড অ্যালগরিদম'।

ঠিক কী হল এই বদলের ফলে? আগে ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্ট ও ভিডিও সবটাই সময়ানুসারে আসত অর্থাৎ নতুন পোস্ট সবার আগে দেখা যেত। ফলে একটা বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্যও দেখতে পাওয়া যেত। নতুন অ্যালগরিদম চালু হবার পর ফেসবুক আপনাকে সেটাই শুনতে ও দেখতে দেয় যা আপনি চান। ব্যবহারকারীর তথ্য বিশ্লেষণ করে যন্ত্র ঠিক করে নেয় মূলত কী ধরনের পোস্ট তিনি দেখবেন। অ্যালগরিদম যাকে সমমনস্ক মনে করছে সেই 'বন্ধু'র নাম, তাকে অ্যাড করার সাজেশন, পছন্দসই গ্রুপ এবং কিছু কিছু নির্বাচিত পোস্ট বারবার আসতে থাকে। অর্থাৎ অ্যালগরিদম শুধু আপনি যা চান তা-ই দেখায় না, এমনভাবে পোস্ট দেখাতে থাকে যা আপনার চাওয়াটাকেই প্রভাবিত করতে পারে। ফলে ক্রমাগত একই ধরনের পোস্ট দেখতে দেখতে এবং লাইক শেয়ার করতে করতে অত্যন্ত দ্রুততায় বাস্তব দুনিয়ার সমান্তরাল একটা ভার্চুয়াল দুনিয়া গড়ে ওঠে। যেখানে কোনও বিষয় খবর নিয়ে যাচাই করা বা তলিয়ে ভাবার চেয়ে ফরোয়ার্ড করা বা শেয়ার করার তাগিদ অনেক ক্ষেত্রেই অসত্য খবর ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে এবং একই সাথে যে কোনও মত বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধ মত শোনর বা বোঝার পরিসর কমে আসে।

ফেসবুক সহ যে কোনও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের দরকার প্রচুর বিজ্ঞাপন, তার জন্য দরকার অনেক বেশি ট্রাফিক অর্থাৎ বার্তা চলাচল। অর্থাৎ এক কথায় ব্যবহারকারীরর সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের অনেক বেশি সময় ফেসবুকে ব্যস্ত রাখা। এ ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী বিদ্বেষমূলক, সাম্প্রদায়িক এবং উত্তেজক পোস্ট। দেখা গেছে, জনগণের ঐক্য-সম্প্রীতি, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, এমনকি মানুষের প্রাণরক্ষারও তোয়াক্কা না করে এই ধরনের পোস্টগুলিকেই ফেসবুক বেশি প্রমোট করছে। বেশি লাইক কমেন্ট পাওয়ার ঝোঁক থেকে এধরনের আক্রমণাত্মক পোস্ট করার প্রবণতাও বাড়ছে। ২০১৫-তে ফেসবুক চালু করল নতুন ছ'টি বাটন—লাভ, হা হা, ইয়া, ওয়াও, স্যাড, অ্যাংরি। দেখা গেল যে পোস্টে অ্যাংরি ইমোজি পড়ছে সেই পোস্টকে বেশি প্রমোট করতে শুরু করল ফেসবুক। ফেসবুক গবেষকরা বলছেন, এই ধরনের পোস্টে পাঁচগুণ বেশি এনগেজমেন্ট আসে, ফলে মুনাফার সুযোগ আরও বেশি। অথচ দেখা গেছে এই ধরনের পোস্টগুলোই বহুক্ষেত্রে ভুয়ো এবং নিম্নমানের হয়।

সুতরাং মোদ্দা কথা দাঁড়াল, যুক্তিসঙ্গত সঠিক তথ্য বা বিচার বিবেচনার খুব একটা জায়গা ফেসবুকে নেই। তথ্যের প্রামাণ্যতা বা যুক্তিবোধের চেয়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। ফলে রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারছে, বিভেদমূলক মানসিকতাকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এর প্রভাব কতদূর হতে পারে তার প্রমাণ আমেরিকায় ক্যাপিটাল রায়ট, মায়ানমারের ক্যুপ এবং ইথিওপিয়ায় জাতিগত দাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা মেনে নিয়েছেন

সাতের পাতায় দেখুন

মোদি জমানাতেই সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি

খেতে দিচ্ছেন, খাচ্ছেনও

দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে। এবিজি শিপইয়ার্ড নামের একটি সংস্থা ব্যাঙ্ক থেকে ২২,৮৪২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা লোপাট করে দিয়েছে। এসবিআই সহ সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছিল সংস্থাটি। সংস্থার তিন ডিরেক্টরের অন্যতম ঋষি আগরওয়াল প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে প্রকাশ পেয়েছে। গুজরাটের এই সংস্থাটির উত্থান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে। সেই সময়েই সরকারের থেকে নানা সুবিধা পেতে থাকে সংস্থাটি। ঋষি আগরওয়ালকে তখন মোদিজির 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' শিল্প সম্মেলনে দেখা যেত। মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষিণ কোরিয়া সফরেরও তিনি সঙ্গী ছিলেন। এই মুহূর্তে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ২০০ কোটি টাকা বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে, এই রকম একটি সংস্থা এত বিপুল পরিমাণ ঋণ গায়েব করার সাহস পেল কী করে? এত বিরাট জালিয়াতি এতদিন ধরা পড়ল না কেন? স্টেট ব্যাঙ্ক এতদিন চুপচাপ থাকল কেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্কই বা চোখ বন্ধ করে থাকল কী করে? তবে কি এই ধরনের জালিয়াতি ধরার কোনও ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে নেই? বাস্তবে সমস্ত ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। অর্থ মন্ত্রক রয়েছে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক রয়েছে, আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী এসএফআইও রয়েছে, রয়েছে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজ্যান্স ইউনিট, সিবিআই, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট প্রভৃতি অনেক সংস্থা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এতগুলি সংস্থার এমন অদ্ভুত মিলিত নীরবতা কি কোনও সমাপতন নাকি এর পিছনে কোনও বিশেষ কারণ রয়েছে?

দেশে প্রতি বছর কত জন কৃষক আত্মহত্যা করেন? সরকারি হিসেবেও সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। বলা বাহুল্য এই আত্মহত্যার একটা বড় অংশই ঘটে ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে না পারায় ব্যাঙ্ক তথা পুলিশের আতঙ্কে। কারণ এই ঋণ শোধ করতে না পারলে ব্যাঙ্ক তাঁর জমি, বাড়ি সহ সব সম্পত্তি ক্রোক করবে। গোটা পরিবার পথে বসবে। নিরুপায় কৃষক বাঁচার কোনও পথ না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। মাত্র কয়েক দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের এক ছোট ব্যবসায়ী রাজীব তোমর দেনায় তলিয়ে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে গেছেন। সরকারি হিসেবেই ২০১৮ থেকে ২০২০- এই তিন বছরে বেকারত্ব, দেনার দায় বা দেউলিয়া হয়ে পড়ার কারণে প্রতিদিন গড়ে ২৩ জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও বাস্তব হল, এমন একান্ত নিরুপায় না হলে কৃষক কিংবা ছোট ব্যবসায়ী সকলেই ঋণ শোধ করে দেন। কিন্তু ঋণের পরিমাণটা যখন এমন হাজার হাজার কোটি টাকা হয়? তখন কিন্তু কোনও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশ-প্রশাসন সেই ঋণখেলাপিকে হাতকড়া পরিয়ে লকআপে নিয়ে গিয়ে ভরে দেয় না। ভরে যে দেয় না, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই ঋষি আগরওয়াল বা অন্য দুই ডিরেক্টর সন্থানাম মুথুস্বামী এবং অশ্বিনী কুমার কেউই এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি। আসলে এমন বিপুল পরিমাণ ঋণ যাঁরা নেন, সব সময়ই সরকার তথা প্রশাসনের উঁচু মহলে তাঁদের দহরম-মহরম থাকে, যোজসাজশ থাকে। সেই খুঁটির জোরেই পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের টিকিটিও ছোঁয় না।

সরকারি সূত্রেই জানা যাচ্ছে, এবিজি শিপইয়ার্ডের ঋণকে অনাদায়ী বা এনপিএ বলে তালিকাভুক্ত করা হয় ২০১৬-তে। ফরেন্সিক অডিটের ভিত্তিতে ২০১৯-এর জুনে এই ঋণকে 'প্রতারণা' বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ সিবিআই সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সিবিআই তদন্ত শুরু করতে এত দেরি করল কেন? যেখানে কয়েক হাজার টাকার ঋণখেলাপিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ এতটুকু দেরি করে না, সেখানে এত বড় বড় জালিয়াতরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারল কী করে?

মোদি জমানায় ঋষি আগরওয়ালই যে এমন জালিয়াতি প্রথম করলেন তা তো নয়। বিজয় মাল্য কিংবা ললিত মোদির জালিয়াতির কথা নিশ্চয়ই বেশির ভাগ মানুষের মনে আছে। আর প্রধানমন্ত্রীর 'হমারে মেহুল ভাই' মেহুল চোক্সির কথা তো ভোলার নয়। আর আছে যতীন মেহতা, নীতিন সন্দসেরার মতো জালিয়াতরাও। শুধু মোদি জমানাতেই এই জালিয়াতির পরিমাণটা ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

যে ক্ষেত্রে এমন জালিয়াতিও থাকে না, সে ক্ষেত্রগুলিতেও দেখা যায়, অধিকাংশ সময়ই এই বড় ব্যবসায়ীরা ঋণ শোধ করে না, কখনও করলেও আংশিক পরিমাণ শোধ করে বাকিটার জন্য হাত তুলে দেন। ঋণের সেই অংশটা কিছু দিন পড়ে থাকার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাকে 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' (এনপিএ) নাম দিয়ে আরও কিছু দিন ফেলে রাখার পর ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দেয়, যাকে বলে 'রাইট অফ' করে দেওয়া। তারপর সরকার জনগণের করের টাকা থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে সেই টাকা দিয়ে দেয়। এর জন্য প্রতি বছর বাজেটে বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়। অথচ এই সব জালিয়াতরা যে টাকা লুট করে তা যেমন জনগণের কষ্টার্জিত টাকা, তেমনই ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার যে টাকা দিচ্ছে, তা-ও জনগণেরই টাকা। জনগণের বেশির ভাগ অংশই যখন চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তখন তাদেরই টাকা নিয়ে এমন জালিয়াতি চালিয়ে যাচ্ছে এক দল জালিয়াত। আর সরকারের মদত সেখানে স্পষ্ট। তাই দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি নিয়ে এত হইচই হলেও প্রধানমন্ত্রী এখনও চুপ করেই রয়েছেন।

২০১৪ তে ক্ষমতায় বসার আগে নরেন্দ্র মোদির দেওয়া অজস্র প্রতিশ্রুতির বেশির ভাগই মানুষ ভুলে গেলেও এই প্রতিশ্রুতিটি নিশ্চয় ভোলেনি—'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। কংগ্রেস শাসনে দুর্নীতি যখন লাগামছাড়া হয়ে উঠেছিল তখন দেশের অন্তত কিছু মানুষ ভেবেছিল, বিজেপি শাসনে বোধহয় তার অবসান হবে। বাস্তবে বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর অন্য প্রতিশ্রুতিগুলির মতো এটিরও যথারীতি একই পরিণতি ঘটেছে। অবশ্য বিজেপি নেতারা বলবেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বলেই তো আর তা সত্যি হয়ে যায় না। ভোটের আগে এমন কথা বলতে হয়। অমিত শাহের ভাষায়, এ-সবই 'জুমলা' মাত্র। প্রধানমন্ত্রী পদটিকে বিজেপি আজ এমন স্তরেই নামিয়ে এনেছে।

আসলে পুঁজিবাদের সঙ্গে দুর্নীতি বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এটা অনেক বড় পণ্ডিতও ধরতে পারেন না। তাঁরা বুঝতেই চান না, পুঁজিবাদ যে মুনাফাকে উৎপাদন ও ব্যবসার মুখ্য উদ্দেশ্য করেছে তা শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা ছাড়া হয় না। দুর্নীতির উৎসই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতি। প্রতারণাই এই ব্যবস্থার ভিত্তি। এই শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠা সরকার, বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে এমনকি সব তদন্ত সংস্থাগুলিও তাই এই দুর্নীতি-প্রতারণাকে চাপা দিতেই ব্যস্ত থাকে। প্রবল গণআন্দোলন তথা গণপ্রতিরোধ না হলে, প্রবল সমালোচনার সামনে না পড়লে এ নিয়ে তদন্তের ভড়ংটুকুও হয় না। যদিও বা তদন্ত হয়, রিপোর্ট প্রকাশ হয় না, শাস্তি তো দূরস্থান!

স্বাধীন ভারতে শুরুর দিকে এই প্রতারণার পরিমাণ কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকলেও যত দিন যাচ্ছে ততই তা মাত্রাছাড়া হয়ে উঠছে। আর বিজেপি শাসনে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যে ভাবে আইনি-বেআইনি উপায়ে লুটের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তা নজিরবিহীন। রাষ্ট্রের সম্পদ-সম্পত্তি, কল-কারখানা অবাধে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিনিময়ে পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে বিজেপি দল এবং তার নেতা-মন্ত্রীদের উপর। তাই মাত্র ৭ বছরে বিজেপির ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বিপরীতে জনগণের দুর্দশা বেড়েই চলেছে।

২০১৪ তে দেশের পুঁজিপতিরা শাসন ক্ষমতায় যে বিজেপিকে বেছে নিয়েছিল তা এই শর্তেই যে বিজেপি তাদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ করে দেবে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, আইনি-প্রশাসনিক কোনও ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে সরকার পুরনো আইন বদলে দেবে, নতুন আইন নিয়ে আসবে। পুঁজিপতিদের শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভকে দমন করবে। বাস্তবে ঠিক তেমনটিই ঘটছে। সেই জন্যেই নতুন কৃষি আইন, সেই জন্যেই নতুন শ্রম আইন। সেই জন্যেই ইউএপিএ-র কড়াকড়ি। বিনিময়ে পুঁজিপতিরা তাদের ক্ষমতায় বসার এবং টিকে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে, ভোটের খরচ জুগিয়ে চলেছে, নেতা-মন্ত্রীদের বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা করে চলেছে। তা না হলে ঋষি আগরওয়ালরা, ললিত মোদিরা, বিজয় মাল্য, মেহুল চোক্সিরা এমন অবাধে লুঠতরাজ চালাতে পারত না, আম্বানি, আদানিরা রাষ্ট্রায়ত্ত তথা জনগণের সম্পত্তিকে এমন অবাধে আত্মসাৎ করতে পারত না। দেশের জনগণকে আজ এই সত্যটি পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি পুঁজিপতিদের দেখার জন্যই, এবং তা জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। এই ব্যবস্থা যত দিন টিকে থাকবে জনগণের দুর্গতি তত দিনবাড়তেই থাকবে।

ফেসবুক

ছয়ের পাতার পর

এই ঘটনাগুলোয় ফেসবুকের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

২০১৯-এ 'প্রজেক্ট ডেইজি' নামে একটি ইন্টার্নাল প্রজেক্ট নিয়ে আসে ফেসবুক। যেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য লাইক বাটনটাকে হাইড করার (লুকিয়ে ফেলা) প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, কম লাইক পাওয়া থেকে তৈরি হওয়া উদ্বেগ ও হতাশা কমানো। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ফেসবুকের মালিক মার্ক জুকেরবার্গ তা বাতিল করে দেন। ওই একই বছরে ফেসবুকের বিরুদ্ধে আরও একটা গুরুতর অভিযোগ ওঠে যে, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করে মানুষ পাচারের মতো ঘটনাও ঘটছে। মার্ক জুকেরবার্গ এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন যে একদল বেছে বেছে ফেসবুকের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে তার বদনাম করতে চাইছে। কিন্তু ফেসবুক পেপারসে যা আছে তার পুরোটা যদি জনগণের সামনে রাখা যায়, মানুষ জানতে পারবে, সেখানে বাছাই করে বলার কোনও জায়গা নেই। সম্পূর্ণটাই মুনাফার স্বার্থে ফেসবুক কী কী কুকীর্তি করছে তার নজির। সংবাদমাধ্যমের মতো সমাজমাধ্যমেরও দায়িত্ব হওয়া উচিত সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করা।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যমের এই ভূমিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য তাকে মিথ্যের সাথে আপস করতেই হয়। নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে মুনাফাকেন্দ্রিক নীতি নিতেই হয়। পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সমাজে গণতন্ত্রের খোলসে মানুষের সমস্ত কিছু এমনকি হৃদয়বৃত্তিকেও যেখানে একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, সেখানে সমাজমাধ্যম এর বাইরে থাকতে পারে না। ফেসবুক পেপারসের তথ্য আবার প্রমাণ করল, বহুজাতিক পুঁজি পরিচালিত ফেসবুকও এর ব্যতিক্রম নয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

আন্দোলনের চাপে আশাকর্মীদের দাবি আদায়

১৮ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৫ হাজার আশাকর্মীর বিক্ষোভ কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়েছে। এই মহাসমাবেশ উভয় সরকারকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

আশাকর্মীদের প্রশ্ন, সরকারের তাঁদের নিয়োগ করেছে। তা হলে সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া হবে না কেন? এ দিন আশাকর্মীরা ১৫ দফা দাবিতে স্বাস্থ্যভবন, নবান্ন এবং রাজভবনে ডেপুটেশন দেন। নবান্নের প্রতিনিধি স্বাস্থ্যভবনে দেখা করেন। আন্দোলনের চাপে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছেন আশাকর্মীদের প্রাপ্য টাকা আর ৮ ভাগে পাঠানো হবে না। আগের নিয়মেই পাঠানো হবে। জনসমীক্ষার বরাদ্দ টাকা দেওয়া হবে, অ্যান্ড্রোয়েড মোবাইল এবং সেই মতো রিচার্জ খরচ দেওয়া হবে, কোনও মহিলা নার্সিংহোমে ডেলিভারির জন্য চলে গেলেও সেখানে আশাকর্মীর প্রাপ্য কী ভাবে দেওয়া যায় তা নিয়ে নীতি নির্ধারণ করা হবে, কোভিড আক্রান্তদের টাকা ধীরে ধীরে দেওয়া হবে, সমস্ত বকেয়া ইনসেনটিভ মিটিয়ে দেওয়া হবে, কোভিড আক্রান্তদের এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, পোলিও প্রথম দিন বুথ করেই খাওয়ানো হবে এবং এ সংক্রান্ত অর্ডার শীঘ্রই দেওয়া হবে। প্রতিনিধিদের জানানো হয় ইতিপূর্বে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সব অর্ডার আকারে বের করা হবে।

আর বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে সরাসরি কথা তাঁরা দেননি। এই বেতন বঞ্চনার বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান। সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন বলেন, ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তরকন্যা, শিলিগুড়িতে হাজার হাজার আশা কর্মী বিক্ষোভ সমাবেশে সমবেত হবেন।

বিএসএনএল বাঁচাতে কর্মীরা আন্দোলনে

বিএসএনএল কলকাতা টেলিফোনস-এ দীর্ঘ ২০-২৫ বছর কাজ করার পর অন্যায় ভাবে কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছে। 'বিএসএনএল বাঁচাও কমিটি'-র নেতৃত্বে কর্মচ্যুত শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টেলিফোন ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটকর, অমিতা বাগ সহ সংগঠনের নেতৃত্ব। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বিকেল ৩টা নাগাদ মেধা পাটকরের নেতৃত্বে অমিতা বাগ সহ সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসেন।

দীর্ঘ ৩ ঘন্টা আন্দোলনকারী প্রতিনিধি দলের সাথে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের বৈঠক চলে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যার দায় ঠিকাদারদের ঘাড়ে চাপিয়ে বিষয়টি এড়াতে চাইলে প্রতিনিধি দল তার প্রতিবাদ করে সঠিক তথ্য তুলে ধরে। কর্তৃপক্ষ কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ইপিএফ সংক্রান্ত তথ্য এবং বেশি কাজ করিয়ে কম বেতন দেওয়ার সঠিক তথ্য চান। এদিনের বৈঠক ও আন্দোলন সম্পর্কে মেধা পাটকর বলেন, আগামী দিনে কর্মচ্যুত বিএসএনএল কর্মীদের অধিকার আদায়ে রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি পথেও লড়াই শুরু হবে। তিনি কর্মচ্যুত শ্রমিকদের বাড়ির মহিলাদেরও আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

রাজ্য সরকারের দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল ও সকল বেকারের কাজের দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি এআইডিওয়াইও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বারাসাত শহরে মিছিল

ফরেনার্স ট্রাইবুনাল নয়, নাগরিকত্বের বিচার হোক বিচারবিভাগীয় আদালতে

ন্যায় বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকৃত ভারতীয়দের বিদেশি হিসাবে ঘোষণা প্রক্রিয়া আজও চলছে আসামে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি। রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কর্তৃক একতরফাভাবে রায়দান ও অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ এবং ভ্রান্ত নোটিস প্রদানের বিরুদ্ধে ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জের জেলাধিপতির মাধ্যমে স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন।

এই স্মারকপত্রে অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলা হয় যে এটা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আসামের বিভিন্ন ফরেনার্স ট্রাইবুনাল একতরফাভাবে তথাকথিত বিদেশি ঘোষণা অবিরত করে চলেছে এবং তার সঙ্গে যেগুলো পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে রায়দান হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক। এভাবে একটা বিরাট সংখ্যক নাগরিককে বিদেশি ঘোষণা করা হচ্ছে এবং সেই অনুসারে তাদের সমস্ত ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা মৃত্যুদণ্ড থেকেও মারাত্মক। প্রকৃতপক্ষে ঘোষিত বিদেশিরা বেশিরভাগই অত্যন্ত গরিব মানুষ এবং সত্যিকার অর্থে ভারতীয় নাগরিক।

'নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি, অসম'-এর অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য জেলাধিপতির অফিসের সামনে (ছবি) ক্ষোভের সাথে বলেন, নাগরিকত্ব একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এটা নিয়ে সরকারের ছেলেখেলা করা উচিত নয়। যে প্রক্রিয়ায় ফরেনার্স ট্রাইবুনাল নাগরিকত্বের বিচার করছে সেটা বাস্তবিকই আইনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কারণ বিদেশি নোটিশ পাঠানোর আগে যথার্থ কোনও তদন্তও হচ্ছে না। আর বর্ডার পুলিশ যদি বা কোনও তদন্ত করেও থাকে তা হলেও তার যথার্থ তদন্ত রিপোর্ট হচ্ছে না। যথার্থ তদন্ত রিপোর্ট ছাড়া ফরেনার্স ট্রাইবুনালের প্রোসিডিং চলতে পারে না। তিনি আরও বলেন নাগরিকত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আধা বিচারবিভাগীয় সংস্থা (কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি) হিসাবে ফরেনার্স ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া চালানো কোনওমতেই উচিত নয়।

সমিতির দাবি, ১) ফরেনার্স ট্রাইবুনাল এর পরিবর্তে বিশেষ বিচারবিভাগীয় আদালত গঠন করে পূর্ণাঙ্গ বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্বের বিচার করতে হবে। ২) ডি ভোটারের নতুন নোটিস প্রদান বন্ধ করতে হবে। ৩) ভিত্তিহীন তথাকথিত বিদেশি নোটিস দেওয়া বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্মারকপত্র প্রদান কালে প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনীত রঞ্জন দত্ত, পরিমল চক্রবর্তী, তুষার দাস, বিষ্ণু দত্ত পুরকায়স্থ, গোপাল পাল, অজয় চৌধুরী, প্রীতি লাল দাস প্রমুখ।

পিপিপি মডেলে স্কুল!
তীব্র নিন্দা সেভ এডুকেশন কমিটির

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ১৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর পিপিপি আঙ্গিকে স্কুল চালানোর যে পরিকল্পনা করেছে সেই খবরে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্কুলের ভবন ও লাগোয়া জমি যা সরকারি অর্থ এবং জমিদাতাদের আনুকুল্যে গড়ে উঠেছে তা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারা তা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে যা সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে শিক্ষা আরও ব্যয়সাপেক্ষ হবে এবং গরিব মানুষের হাতের বাইরে চলে যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা, পিপিপি আঙ্গিকে সরকার যাই শুরু করুক এবং যত ভাল কথার মোড়ক তাতে থাকুক, ধীরে ধীরে তা পুরোপুরি বেসরকারি অধীনে চলে যায়। ফলে, সরকারের এই পদক্ষেপ শিক্ষার বেসরকারিকরণেরই প্রাথমিক ধাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এইভাবে শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার নিদান আছে। ফলে রাজ্য সরকার অন্য ভাবে জাতীয় শিক্ষানীতিই চালু করছে। আমরা রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে তা বাতিল করার দাবি করছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com